অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বাজেট প্রস্তাবনা ও সর্বজন

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চেয়ারপারসন, উন্নয়ন অন্বেষণ

১. ভূমিকা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার মাঝেই দেশের ৪৮তম জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০ পেশ করা হয়েছে। সরকারি হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি তর তর গতিতে এগুচ্ছে। অন্যদিকে জাতীয় আয় বা জিডিপির হিসেব, গুণগত মান এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে ঢিমেতালে কথাবার্তা হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বৈষম্য আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই ধারা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না। অংশগ্রহণ বাড়লেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতের গুণগত মান প্রশ্নের সম্মুখীন।

বাজেটের পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, খাতভিত্তিক বরাদ্দ ও সমস্যা নির্ধারণ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হচ্ছে। অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ অত্যধিক। প্রতিবছরই বাজেটে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ঘাটতি মেটাতে ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। বাজেট বাস্তবায়নের হারেও দেখা যায় নিম্নমুখিতা।

২. জাতীয় আয়ের হিসাবে গড়মিল

২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় এবং জাতীয় সঞ্চয় উভয়েই কমেছে। দেশজ সঞ্চয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির ২৫.৩৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২.৮৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক প্রাক্কলনে দেশজ এবং জাতীয় উভয় ধরনের সঞ্চয় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও তা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় যৎসামান্য। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ ০.৫৬ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেসরকারি এবং সরকারি বিনিয়োগ যথাক্রমে ০.১৪ ও ০.২ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি মোটেও প্রবৃদ্ধির উল্লম্ফন ধারার কাছে তেমন কোনো গতিরই না।

দিন দিন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মধ্যে ফারাক বাড়ছে। পুঁজি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে বা পাচার হলে এই ফারাক বাড়ে। গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির হিসেবে ২০০৬-২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়ে গেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই ভোগ বাড়লেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক প্রাক্কলনে তা বরং কমেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভোগ যথাক্রমে ৬ শতাংশ এবং ৬৮.৬৭ শতাংশ ছিল।

জনগণের একটা বিরাট অংশ বেকার থাকায় ও বেকারত্ব বাড়ায় আয় বাড়ছে না। বিশ্বব্যাংক ও আইএলও বলছে, ১৯-১৯ বছর বয়সী না অধ্যয়নরত, না কোন কর্মে ও না প্রশিক্ষণে নিয়োজিত যুবকের সংখ্যা ২০০৫ সালের শতকরা ৩১ ভাগ থেকে ১০ বছরে ১০ ভাগ বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বেকার যুবকের হারেও বাংলাদেশে সবচে' বেশি। শতকরা ৯.৪৫ ভাগ। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ কমেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় ২০০৮-১৭ সময়কালে বাংলাদেশের মানুষের গড় প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে কম (৩.৪ শতাংশ)। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ মতে, ২০১০ সালের তুলনায় পুষ্টি গ্রহণের হার ৫ শতাংশ কমে ২ হাজার ৩১৮ কিলোক্যালরি থেকে ২ হাজার ২১০ কিলোক্যালরিতে পৌঁছেছে।

জাতীয় আয় বাড়লে দারিদ্র্য কমার হারও বাড়ার কথা। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমার হার ছিল ১.৭ শতাংশ। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে এই হার ২.২ শতাংশে নেমেছে।

জাতীয় আয়ের হিসাবের তৃতীয় অংশটি আসে আমদানি ও রপ্তানির নিট আয় থেকে। আমদানি ব্যয় সবসময়ই বেশি থাকলেও ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৮.২ শতাংশের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি-জিডিপি অনুপাত কমে হয়েছে ১৩.২ শতাংশ। বাণিজ্য ও চলতি লেনদেনে ঘাটতি বাড়ছে। রফতানি খাতের বহুমুখীকরণ এবং বৈচিত্র্য নেই। মূল্য সংযোজন ২০ শতাংশের বেশি থাকে না।

ভারতের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অরবিন্দ সুব্রামানিয়ান সম্প্রতি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ভারতে জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার সরকারি হিসাব থেকে ২.৫ শতাংশ কম। সরকারি হিসাবে ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ সময় ভারতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৭ শতাংশ। গবেষণায় উঠে এসেছে, এই সময় প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫ শতাংশ। বাংলাদেশেও যদি এ ধরনের গবেষণা চালানো হয় তবে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার সরকারি হিসাব থেকে একই হারে কমে ৪-৫ শতাংশের মতো পাওয়া যাবে।

৩. রাজস্ব আয়-ব্যয়ে ভারসাম্যহীনতা

ঘোষিত ও সংশোধিত বাজেটের কর আদায়ের পরিমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ১০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে রাজস্ব কর আদায় হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৯৪ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব কর আদায় বাড়াতে হবে ৭৫ শতাংশ। অতীত অভিজ্ঞতা বলে যা কখনও সম্ভব নয়। মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ করদাতা। প্রতিবেশী দেশে অপেক্ষাকৃত কম হলেও করদাতার পরিমাণ প্রায় ১৮ শতাংশের মতো। পরিসংখ্যান বলছে, সামর্থ্যবান মানুষের ৬৮ শতাংশই করের আওতায় নেই। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগণের উপর করের ভার বর্তাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাস্তবায়িত বাজেটে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ছিল ২৩ হাজার ৭৮ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনায় ভ্যাটের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৯ বছরে ভ্যাটের হার প্রায় ৩৮০ শতাংশ বেড়েছে।

ঘোষিত বাজেটে ৫টি মৌলিক চাহিদার ৩টিতেই চাপ বেড়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমানা বাড়ানো, টেলিফোনে কথা বলার ওপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি, পোশাকে ভ্যাট বাড়ানো এবং খাদ্যপণ্যে ট্যারিফ মূল্য বিলুপ্তির ঘোষণা করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে কথা বলার ওপর সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এতে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ বাড়বে। নিত্য ব্যবহার্য পোশাকের ওপর ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে। কেউ পোশাক কিনলে চলতি অর্থবছরে মোট দামের ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে তা আরও আড়াই শতাংশ বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে দর্জির দোকানের মূল্য পরিশোধের ওপর নতুন করে ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে।

ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু আয় বাড়ছে না। ফলে বাজেটে প্রতিবছরই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ বাজেটে ঘাটতি ১,৪৫,৩৮০ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটাতে ঋণ নিতে হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সুদ-আসল পরিশোধ করতেই বিশাল ব্যয় হচ্ছে। বাজেট বরাদ্দের তৃতীয় সর্বোচ্চ খাত এখন ঋণের সুদাসল পরিশোধ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে রাজস্ব ব্যয়ের ১৮ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ঋণ বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ সরকারি চাকরিতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও গণহারে পদোন্নতির মাধ্যমে বেতন কাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেতন-ভাতার জন্য রাজস্ব ব্যয়ের ২০.৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ বাজেটে জনপ্রশাসনেই বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৮.৫ শতাংশ। উপ-সচিবের ৮৫০টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৫৫৪ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। যুগ্ম-সচিবের ৪৫০টি পদের বিপরীতে ৭৮৭ জন, অতিরিক্ত সচিবের শতাধিক পদের বিপরীতে ৪৩৫ জন কর্মরত আছেন। এরসাথে যোগ হয়েছে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ব্যয় কতটা গুণসম্পন্ন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে অনিয়মের খবর জনসমক্ষে এসেছে।

৪. ৪. বৈদেশিক লেনদেন স্থিতির ভারসাম্যহীনতা

চলমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের ফারাক বাড়ায় ১৩,৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে। প্রবাসী আয়েও মন্দাভাব লক্ষণীয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সামান্য বাড়লেও (১৩,৩০৩ মিলিয়ন ডলার) গত কয়েক বছর প্রবাসী আয়ের প্রবাহে উঠানামা উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। ফলে চলতি হিসাবে ৫,০৬৫ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি।

বাংলাদেশে ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪,৩১৪ মিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৩,২২০ মিলিয়ন ডলার ছিল। ৩৩.৯৮ শতাংশ বেড়েছে। অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আগের অর্থবছরের একই সময়ের ১৬১ মিলিয়ন থেকে একই রকমের উল্লম্ফন দিয়ে এবছরে ১০০৫ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। গত ৯ মাসে সরকার ৪.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ নিয়েছে যেখানে আগের বছর একই সময় এই পরিমাণ ছিল ৩.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ২০১৭ অর্থবছর থেকে ক্রমহ্রাসমান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে রিজার্ভের পরিমাণ ৩১,৭৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের একই সময়ে সামান্য বেড়ে ৩২,১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।

৫. সামাজিক খাত: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো খাত সবচেয়ে অবহেলিত। অবকাঠামোতে খরচ বাড়লেও গুণগত মান পড়ছে। বিদেশ থেকে জনশক্তি আনতে হচ্ছে। পত্রিকান্তরে জানা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারত প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার অভিবাসী আয় হিসেবে পেয়েছে। ব্যক্তি প্রতি স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার খরচ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে ব্যক্তি প্রতি স্বাস্থ্যখাতে খরচ মোট খরচের ৬৭ শতাংশ। ভারত (৬২ শতাংশ), পাকিস্তান (৫৬ শতাংশ), নেপাল (৪৭ শতাংশ), ভুটান (২৫ শতাংশ) ও মালদ্বীপ (১৮ শতাংশ)। একদিকে বাজেটে বরাদ্দ কম, অপরদিকে গুণগত মানও বাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ১৩.৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে একযোগে রাজস্ব ব্যয়ের ১৩.২ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ৪.৩ শতাংশ। শিক্ষা খাতের গুণগত মান বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে বাজেটে বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে বরং প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন না হয়ে বিদেশে রেমিটেন্স হিসেবে অর্থ চলে যাবে। আবার যে অল্প কিছু টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় তার অধিকাংশই খরচ হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়নে।

৬. কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তি খাত

অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র। এই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষক অত্যধিক মূল্যে এইসব প্রযুক্তি সেবা কিনতে পারছে না। কৃষি জমি একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হচ্ছে, অন্যদিকে এগুলোর উর্বরা শক্তিও কমছে। এই খাতে বাজেটের বরাদ্দও সামান্য। ২০১৯-২০ বাজেটে মাত্র ৫.৪ শতাংশ উন্নয়ন ধরা হয়েছে। এসব কারণে কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম প্রবল। বাজেটে কৃষকদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য তেমন প্রণোদনা নেই।

আবার উৎপাদনশীল খাতের পরিমাণ বাড়ছে না ও বহুমুখীকরণ হচ্ছে না। এক খাতকেন্দ্রিক নির্ভরতা অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। গত ছয় বছরে শিল্প-কারখানার সংখ্যাও বাড়েনি, কমেছে ৬০৮টি। ২০১২ সালে বড় শিল্প-কারখানা ছিল ৩ হাজার ৬৩৯টি, ২০১৯ সালে সংখ্যা কমে ৩ হাজার ৩১টি হয়েছে। মাঝারি শিল্প-কারখানা ৬ হাজার ১০৩টি থেকে কমে ৩ হাজার ১৪টি হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানার সংখ্যাও কমেছে। শিল্পখাতে বর্তমানে ১ লাখ ২৯ হাজার জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ২০-২২ লাখ চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণীর তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

বাজেটে পোশাক শিল্প খাতে প্রণোদনা হিসেবে ২৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিকল্প অন্য কোনো খাতে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা নেই। পোশাক-শিল্প খাতের প্রভাব বেশি থাকায় তারাই সুবিধা পাচ্ছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে একযোগে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৫.২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১৪.৬ শতাংশ। সামান্য বাড়লেও প্রযুক্তি খাতে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দ নিতান্তই স্বল্প।

৭. আর্থিক খাত

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, অবলোপন করা ঋণ-সহ খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ২০০৯ সালের শুরুতে ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের হার এখন সর্বোচ্চ ১১.৮৪ শতাংশ। এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খেলাপি ঋণের হার কমে আসলেও বাংলাদেশে বেড়েই চলছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০১৫ সালে বড় ঋণখেলাপিদের বিশেষ সুবিধা দিতে বড় অঙ্কের ঋণ পুনর্গঠনের নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছে।

৮. দারিদ্র্য ও অসমতা

অসমতা বাড়ছে হু হু করে। ২০১৬ সালে বৈষম্য পরিমাপকারী জিনি সূচক ০.৪৮ দাঁড়িয়েছে। ২০১০ সালে ০.৪৫৮ ছিল। ২০১৬ সালে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের আয়ের অংশীদারিত্ব ২০১০ সালের তুলনায় কমে ১.০১ শতাংশ হয়েছে। ২০১০ সালে ২ শতাংশ ছিল। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমার হার ছিল ১.৭ শতাংশ। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে এ হার কমে ১.২ শতাংশে নেমেছে। দারিদ্র্যের আয় স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে দেখানো হয় আয় বাড়ার ফলে দারিদ্র্যের হার কত শতাংশ কমেছে। ২০০৫-২০১৬ সময়কালে অন্যান্য দেশের চেয়ে বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হার বাংলাদেশে তুলনামূলক কম (৫ শতাংশ) – যেখানে ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানে এই হার প্রায় ১৫ শতাংশের কাছাকাছি।

৯. বাজেট ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতাহীনতা

বাংলাদেশের বাজেট ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার চর্চা নেই। বাজেট ঘোষিত হওয়ার পর আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী সংশোধিত বাজেট সংসদে উপস্থাপনের সাথেসাথেই প্রায় আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়। কেন সংশোধনের প্রয়োজন হল বা কেনইবা বাস্তবায়িত হল না – কোনো তর্কাতর্কি হয় না। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী কণ্ঠভোটে বাজেট পাশ করা ছাড়া সাংসদদের কোনো প্রকৃত ক্ষমতাও নেই। অর্থাৎ বাজেটের পুরো প্রক্রিয়াটিতে জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান প্রক্রিয়ায় সাংসদদের কার্যকর কোনো ভূমিকা নেই। বাজেট ব্যবস্থার আমূল সংস্কার আশু প্রয়োজনীয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুস্থ ধারায় রাখার জন্য স্বাধীনতার তিনটি মূল স্তম্ভকে – সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার – মৌল চলক ধরে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তার অন্যথা হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

(প্রবন্ধটি ২১ জুন ২০১৯, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত)